মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে

ইমদাদ ইসলাম

আমাদের দেশের যে সকল সমস্যা সমাজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে মাদকের ভয়াল থাবা। দিন দিন মাদকের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ মরণব্যাধি। দেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা ঠিক কত তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন হিসেবে কম-বেশি এক কোটি বলা হয়ে থাকে। বেসরকারি সংস্থা মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধের হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর মধ্যে এক কোটি মাদকাসক্ত এবং বাকি ৫০ লাখ মাঝেমধ্যে মাদক সেবন করে। যেখানে প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী। বর্তমানে দেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মাদকের কেনা-বেচা হয় না। শহর থেকে শুরু করে গ্রামেও এটি সহজলভ্য। নিষিদ্ধ জগতে অস্ত্রের পর মাদকই সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে মাদকের অপব্যবহারের শিকার করে তুলেছে মাদক ব্যবসায়ীরা।

মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ মাদকের বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এশিয়ার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ওয়েজ নামে পরিচিত মাদক চোরাচালানের তিনটি প্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রে বাংলাদেশের অবস্থান। মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের পথ হিসেবে ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে একত্রে বলা হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট। এই অঞ্চল বাংলাদেশের পশ্চিমে। আর গোল্ডেন ওয়েজ হচ্ছে ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, নেপাল ও ভুটানের কিছু অংশ। এই অংশ বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত। বাংলাদেশ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল (মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং লাওস) এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অর্থাৎ পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তাই আন্তর্জাতিক মাদক কারবারিরাও বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে সহজে ব্যবহার করতে পারছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে শতশত নদ-নদী দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মাদক চোরাকারবারিরা সমুদ্র উপকূল ও জলপথকে তাদের পণ্য পাচারের খুবই উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচনা করে।

আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে মাদক বলতে গাঁজাকেই বুঝানো হতো। মাদকসেবীরা সে সময় গাঁজাই সেবন করতো। এরপর এলো ফেনসিডিল। এখন ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন আর গাঁজার বাইরেও অন্তত ২০ ধরনের মাদক সেবন করে মাদকসেবীরা। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, গত ১০ বছরে নেশাখোর সন্তানের হাতে প্রায় দুইশত মা-বাবা খুন হয়েছে, স্বামী হত্যা করেছে স্ত্রীকে, স্ত্রী হত্যা করেছে স্বামীকে। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, পরকীয়া প্রেম, দাম্পত্য কলহ, অর্থ লেনদেন, হত্যা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম সবকিছুর মূলেই রয়েছে এই মাদকের নেশা। দেশে শতকরা ৬১ শতাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতী যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে তাদের মাদক সেবনের হার বেশি। তারা সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর থেকে আসে। বাংলাদেশে অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম অ্যালকোহল সেবনের ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি বুপ্রেনরফিন এবং ট্রানকুইলাইজার ওষুধের আসক্তির ব্যবহার বেড়েছে। বুপ্রেনরফিন হলো একটি ওপিওয়েড ওষুধ যা ব্যথা এবং ওপিওয়েড আসক্তির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। বুপ্রেনরফিনের প্রকোপ গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন এবং অ্যালকোহলের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম। ঢাকা বুপ্রেনরফিনের সর্বাধিক প্রকোপযুক্ত এলাকা।

ট্রানকুইলাইজার, মানসিক চাপ ও উত্তেজনা কমানোর একটি ওষুধ যা প্রশান্তি দেয় । উদ্বেগ এবং অনিদ্রার চিকিৎসার জন্য ট্রানকুইলাইজার ব্যবহার করা হয়। মাদকাসক্তি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে খুব কম লোকই ঘুমের ওষুধ, সম্মোহিতকারী এবং ট্রানকুইলাইজার ওষুধের আসক্তির জন্য চিকিৎসা নেয়। এই ওষুধের অপব্যবহারের প্রবণতা নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও মানসিক

চাপ, উদ্বেগ বা মেজাজের ব্যাধিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যেও বেশি দেখা যায়।। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে ট্রানকুইলাইজার অজানা ছিল। ১৯৩০ এর দশকে রাউওলফিয়া সার্পেন্টিনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যা বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়। এরপর থেকে এটি চিকিৎসা সেবায় ব্যবহার হচ্ছে। এই ওষুধের অনেক অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন নিম্ন রক্তচাপ , আলসার, দুর্বলতা, দুঃস্বপ্ন, নাক বন্ধ হওয়া এবং বিষণ্নতা। এটি মূলত মনোরোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মতে ১০টি কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন নামে ট্রানকুইলাইজার ওষুধ বাজারে বিক্রি করছে। এই ওষুধ দ্রুত কাজ করে এবং এতে মানুষ দ্রুত গভীর ঘুমে পতিত হয়। আর এ সুযোগটি কাজে লাগায় দুষ্কৃতকারীরা। গণপরিবহনে যাত্রীদের অজ্ঞান করতে ট্রানকুইলাইজার ওষুধ ব্যবহার করে তারা।

বাংলাদেশে মাদকের জগতে আরও একটি নতুন নাম আইস বা ক্রিস্টাল মেথ। এটি মূলত একটি রাসায়নিক পদার্থ। আইসের চালানটি সরাসরি মিয়ানমার থেকে এসেছিল। আইস বা ক্রিস্টাল মেথে শতভাগ এমফিটামিন থাকায় এটা বিশ্বজুড়েই ভয়ংকর মাদক হিসেবে চিহ্নিত। আইস মানবদেহে অতি অল্প সময়ে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এতে মস্তিষ্কের রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এই মাদক সেবনের ফলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আইসের সবচেয়ে বড় খুচরা বাজার ঢাকা শহর এবং এর পরেই চট্টগ্রামের অবস্থান। এর দাম অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণরাই এর প্রধান ক্রেতা। অল্প মাত্রায় সেবন করলে বেশি মাত্রায় আসক্তি হয়। এ কারণে যারা ইয়াবা আসক্ত তারাও আইসে ঝুঁকছে। আইস দিয়ে নতুন মাদকাসক্তও হচ্ছে। কারণ এর তীব্রতা ইয়াবার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি । আইসের চোরাচালান এবং আসক্তের সংখ্যা দুইটিই বাড়ছে। মাদক গ্রহণকারীর মধ্যে শীর্ষে আছে গাঁজায় আসক্তরা। এর পরেই আছে অ্যামফিটামিন মানে ইয়াবা এবং আইস ।

ইয়াবা একধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট। এটি মূলত মেথঅ্যাম্ফিটামিন ও ক্যাফেইন এর মিশ্রণ। কখনো কখনো এর সাথে হেরোইন মেশানো হয়। এটি আমাদের দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মাদককারবারি ও মাদকাসক্তদের কাছে সাধারণত ‘বাবা, গুটি, বেদোনা, ইশতুপ, আপেল, পাথর, দানা, পোক, বিচি, বিমান, ট্রেন, নৌকা, ঘোড়া এবং কালোজিরা’ নামেও পরিচিত। এ মাদক আমাদের দেশে পার্শ্ববর্তী মায়ানমার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে আসে। এ মাদকটি মূলত হিটলার এর সময়ে নাৎসি সেনাদের টেবলেট হিসেবে সেবন করানো হত যেন যুদ্ধ চলাকালে তারা ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় জেগে থাকতে পারে কিন্তু বর্তমানে ট্যাবলেটটি বিভিন্ন দেশে মাদক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইয়াবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হেরোইনের চেয়েও ভয়াবহ। নিয়মিত ইয়াবা সেবন করলে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ, নিদ্রাহীনতা, খিঁচুনি, ক্ষুধামন্দা এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা যেতে পারে। ইয়াবা গ্রহণের ফলে ফুসফুস, কিডনি সমস্যা ছাড়াও অনিয়মিত এবং দ্রুতগতির হৃৎস্পন্দনের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত হারে ইয়াবা গ্রহণ হাইপারথাইরয়েডিজম বা উচ্চ শারীরিক তাপমাত্রার কারণ হতে পারে। অভ্যস্ততার পর হঠাৎ ইয়াবার অভাবে সৃষ্টি হয় আত্মহত্যা প্রবণতা এবং হতাশা। দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা খেলে স্মরণশক্তি কমে যায়, সিদ্ধান্তহীনতা শুরু হয় এবং কারও কারও ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকে পাগল হয়ে যায়। ডিপ্রেশন বা হতাশাজনিত নানা রকম অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এমনকি অনেকে আত্মহত্যাও করে থাকে। এছাড়া হার্টের ভেতরে ইনফেকশন হয়ে বা মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিঁড়েও অনেকে মারা যায়। অনেকে রাস্তায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

মাদকাসক্তি বর্তমানে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ও অর্থনীতির জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ নয় বরং সামাজিক অস্থিরতা, অপরাধ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ যখন মাদকের করাল গ্রাসে আটকে যায় তখন তাদের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় যা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য চরম বিপদ ডেকে আনে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মাদকের বিস্তার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক নির্মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এছাড়া, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

মাদকের ভয়াবহতা থেকে তরুণদের রক্ষা করতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা দরকার। পাশাপাশি, কর্মসংস্থান ও বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করা গেলে তরুণরা মাদকাসক্তির পথে পা বাড়াবে না। মাদকমুক্ত একটি বাংলাদেশ গড়তে হলে সরকার, সমাজ ও পরিবারকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে নতুন প্রজন্ম একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। আসুন, সবাই মিলে মাদককে না বলি এবং সুস্থ, উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করি।

#

পিআইডি ফিচার